জয়কে রাজনীতিতে টানা-২

আওয়ামী লীগ কি তারুণ্য ও তরুণ নেতৃত্ব সত্যই হারিয়েছে

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

বাংলাদেশেও দীর্ঘ সামরিক ও স্বৈরাচারী আমলের ইতিহাস-বিকৃতি, অসত্য প্রচার ও অসাধু রাজনীতির মোহজাল ছিন্ন করে দুই দশকের তরুণদের এক বিরাট অংশের মনমানসিকতা সুস্থ করার কাজটি শেষ করতে যেমন দীর্ঘ সময় লাগবে, তেমনি লাগবে সঠিক পরিকল্পনা। কোনো প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার আগে এই কাজটি কারও পক্ষেই শুরু করা সম্ভব নয়, সহজও নয়। সুতরাং আওয়ামী লীগ কেবল নিজের কোনো ত্রুটির (যেমন গতিহীন হওয়া) জন্য তরুণ সমাজকে আগের মতো আকর্ষণ করতে পারছে না, এমন ঢালাও মন্তব্য সঠিক নয়

আওয়ামী লীগ তারুণ্য হারিয়েছে এই কথাটি আমি মানতে রাজি নই। শেখ হাসিনার জন্ম ১৯৪৭ সালে। বর্তমানে তাঁর বয়স মাত্র ৫৭ বছর। অর্থাৎ ষাট বছরেরও নিচে। সুতরাং বয়সই যদি তারুণ্যের একমাত্র পরিচয় হয়, আওয়ামী লীগের নেতার পদে তো একজন তরুণই আছেন। তাহলে আরও তরুণতর বয়সের সজীব ওয়াজেদ জয়কে হাসিনা-নেতৃত্বের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে এখনই টেনে আনতে হবে কেন? আওয়ামী লীগে হাসিনা-পরবর্তী নেতৃত্বের প্রশ্নটি এখনই তোলা কেন?

ব্রিটেনে কনজারভেটিভ বা টোরি দলকে পুনর্জীবন দিয়ে দীর্ঘকালের জন্য ক্ষমতায় এনেছিলেন মার্গারেট থ্যাচার। তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। আমেরিকায় রিপাবলিকান দলকে 'রিভাইটালাইজ্ড' করেন প্রেসিডেন্ট রেগান। প্রেসিডেন্ট পদে বসার সময় তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি ছিল। ভারতে বিজেপি দলের এবং তার জোট সরকারের 'প্রাণপুরুষ' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যে অটল বিহারী বাজপেয়ী, তিনিও কি অশীতিপর বৃদ্ধ নন? গত সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি পরাজিত না হলে বাজপেয়ী এবারও ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতেন।

ষাটের কাছাকাছি অথবা ষাটোর্ধ বছর বয়সের ব্যক্তিরাই এখন সারা বিশ্বে রাজনৈতিক দলের অথবা সরকারের নেতৃত্বে রয়েছেন। তাহলে ৫৭ বছর বয়সের শেখ হাসিনাকে নিয়ে বাংলাদেশে তাঁর তথাকথিত শুভানুধ্যায়ী ও হিতৈষীদের এতো মাথাব্যথা কেন? শেখ হাসিনার সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আর যাঁরা আছেন, আবদুস সামাদ আজাদ ও জিল্লুর রহমানের মতো দু'একজন ছাড়া আর কাউকেই কি বয়োবৃদ্ধ নেতা বলা চলে? তোফায়েল আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, মতিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম, আবদুল হামিদ প্রমুখ এঁদের কাকে আমি বয়োবৃদ্ধদের দলে ফেলে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পরামর্শ দেব? এঁদের বয়স এখনও শেষ তারুণ্যের পর্যায়ে। এটাই তো রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার আসল বয়স। এঁদের বুড়োদের দলে পাইকারিভাবে ফেলতে হলে সিপিবির মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, জাসদের আসম আবদুর রব এবং আরও অনেকের কথা কিভাবে আলাদা করে ভাবব? ড. কামাল হোসেন তো প্রায় আমার বয়সী। তিনি গণফোরামের নেতৃত্ব আঁকড়ে ধরে আছেন কী জন্য? আর ৮০ বছরের কাছাকাছি বয়সেও যিনি 'চির তরুণ' এবং 'চির বিপ্লবী' সেই নির্মল সেনের কথা এখানে আর নাই টানলাম।

রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ একজন তরুণকে টেনে এনে কোনো রাজনৈতিক দলের মাথায় বসালেই যদি দলটির তারুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে, তাহলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে একজন নারী এবং প্রধান বিরোধী দলের নেত্রীর পদে একজন নারী থাকা সত্ত্বেও দেশটিতে নারীমুক্তি ঘটছে না কেন? দেশটিতে নারী নির্যাতন আরও বেশি বেশি করে কিভাবে ঘটতে পারে এবং দেশটি আফগান-স্টাইলের তালেবানী রাষ্ট্র হওয়ার পথে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে যেতে পারে?

আমার কোনো কোনো কলামিস্ট বন্ধু যে লেখেন, 'আওয়ামী লীগ বর্তমানে গতিহারা হয়েছে' এবং 'তারেক রহমান বিএনপির তরুণ সমাজকে গতিশীল করেছেন', তাতে আমার হাসি পায়। আওয়ামী লীগ যদি (হাসিনা-নেতৃত্বে) গতিহারাই হয়ে থাকে, তাহলে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর দলটির নেতাকর্মীদের ওপর যে ভয়াবহ নির্যাতন নেমে আসে এবং অব্যাহতভাবে চলছে (দুঃসাহসের সঙ্গে বলছি, যে নির্যাতনের সামনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগও দিশেহারা হতো; কারণ কম্যুনিস্ট পার্টির মতো আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্টে যাওয়ার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না), তাকে সামাল দিয়ে হাসিনার নেতৃত্বেই দলটি আবার মাথা খাড়া করে দাঁড়ায় কিভাবে?

আওয়ামী লীগের সমর্থিত যুবলীগ ও ছাত্রলীগে অবশ্যই যুগের হাওয়ার পরিণতিতে চরিত্রভ্রষ্ট, নীতিহীন বহু কর্মী ও নেতা আছে। তা সত্ত্বেও যুবলীগ ও ছাত্রলীগে সৎ ও সংগ্রামী নেতা হিসেবে অন্তত দশজনের নাম আমি উল্লেখ করতে পারি, যাঁদের সমতুল্য একজন নেতাকর্মীও বিএনপির ছাত্রদল অথবা যুবদলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতো এবং বিএনপি-জামায়াতের বর্তমান সরকারের মতো তাদের ওপর অত্যাচার চালাতো, তাহলে ছাত্রদল ও যুবদলের কোন পাত্তাই দেশে খুঁজে পাওয়া যেতো না। কিন্তু গত চার বছর ধরে হিটলারের জার্মানির গেস্টাপোর কায়দায় আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর ওপর চরম নির্যাতন চলা সত্ত্বেও যুবলীগ ও ছাত্রলীগ দু'টিই এখন পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে দেশের সৎ তারুণ্যের প্রতীক এবং তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এ দু'টি সংগঠনের দরোজা দেশের সকল শ্রেণীর অসৎ তরুণের জন্য খুলে দিলে আমার কোনো কোনো কলামিস্ট বন্ধুর কথিত 'তরুণ রক্ত-সঞ্চালনে' সংগঠন দু'টি যে ভরে উঠতে পারতো, তার নমুনা কি গত হাসিনা সরকারের আমলে আমরা দেখিনি?

আওয়ামী লীগে অবশ্যই তরুণ-রক্তের সঞ্চালন আবশ্যক। তবে তা সৎ ও আদর্শবাদী তরুণ-রক্ত হওয়া দরকার। অসৎ ও দূষিত তরুণ-রক্ত নয়। জেনারেল জিয়া ক্ষমতা দখল করার পর ছাত্র সংগঠনগুলোকে অর্ডিন্যান্সের যাঁতাকলে ফেলে, অর্থ, ক্ষমতা এবং লাইসেন্স, কন্ট্রাক্ট, পারমিটবাজির প্রলোভনে জড়িয়ে যে অসৎ তরুণ প্রজন্ম সৃষ্টি করে গেছেন, দুঃখজনক হলেও তাদের সংখ্যাই আজ দেশে বেশি এবং তারাই দলে দলে বিএনপির যুবদল ও ছাত্রদলে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছে। এই ভিড় কি আমরা যুবলীগে ও ছাত্রলীগে চাই? তাহলে আর মায়া-পুত্র বা হাসনাত-পুত্রদের আওয়ামী লীগের ত্রিসীমায় না রাখার জন্য হাসিনাকে পরামর্শ দেই কেন? তারাই তো 'চিলড্রেন অব জিয়া এজের' আসল প্রতীক হতে পারে।

ব্রিটেনে থ্যাচারের শাসনামলে উন্মার্গগামী এক তরুণ প্রজন্ম (Upward, mobile young generation) সৃষ্টি হয়েছিল; পঞ্চাশের বা ষাটের দশকের তরুণদের আদর্শবাদিতা যাদের মধ্যে ছিল না। তারা পরিচিত হয়েছিল ভোগবাদী, সুবিধাবাদী এবং অর্থ ও সেক্সপ্রিয় তরুণ প্রজন্ম হিসেবে। এদের নাম দেওয়া হয়েছিল থ্যাচার্স চিলড্রেন বা থ্যাচারের সন্তান। বর্তমানে বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অর্থ ও ক্ষমতাপ্রিয় যে চরিত্রহীন অংশের বেশি প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে, তাদের জিয়া'স চিলড্রেন বা জিয়াযুগের সন্তান (বিএনপির নেতাদের মতে জিয়ার সূর্যসৈনিক) বলে আখ্যা দেওয়াই শ্রেয়। আমার কোনো কোনো কলামিস্ট বন্ধু এদেরই ভিড় দেখছেন ছাত্রদল, যুবদল, এমনকি বিএনপিতেও। যাদের সারথী কি তারেক রহমান? একেই কি তাঁরা ভাবছেন অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভাবতে চাইছেন বিএনপিতে 'তরুণ-রক্তের সঞ্চালন'?

আমি তারেক রহমানের রাজনীতিতে আসার বিরোধী নই। তিনি যদি দলের পরবর্তী নেতা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হন, তাতেও দোষের কিছু আছে বলে মনে করি না। দলে যদি তিনি যথার্থই সৎ ও নীতিনিষ্ঠ তরুণ-রক্তের সঞ্চালন ঘটাতে পারতেন এবং নিজে সেই

তারুণ্যের প্রতীক হয়ে উঠতে পারতেন, তাঁকে আমি অভিনন্দন জানাতাম। কারণ বিএনপিতে পরবর্তী নেতৃত্বদানের দাবিদারদের মধ্যে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী এখন দল থেকে বিতাড়িত। তাঁর মতো আরও কয়েকজন দলের মধ্যে কোণঠাসা। এই অবস্থায় এককালের চরিত্র-বিচ্যুত বাম মান্নান ভূঁইয়া, '৭১-এর রাজাকার সা.কা. চৌধুরী বা জামায়াতের ক্রোড়াশ্রিত ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বা এই জাতীয় লোকেরা এসে যদি খালেদা-পরবর্তী বিএনপির হাল ধরেন, তাহলে দলটির অস্তিত্ব থাকবে না, অথবা দলটি এখনই জামায়াতের পেটে অর্ধেক চলে গেছে, তখন বাকিটাও চলে যাবে। আমি 'ভোরের কাগজের' সম্পাদক আবেদ খানের সঙ্গে (২৩ নবেম্বর 'ভোরের কাগজে' প্রকাশিত তাঁর কলাম দৃষ্টব্য) সম্পূর্ণ একমত। আগামী নির্বাচনেও যদি ছলচাতুরী দ্বারা বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসে তার পরিণতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'আগামী নির্বাচনের পরের নির্বাচনে জামায়াত (এবং তার সহযোগীরা) গঠন করবে সরকার এবং বিরোধী দলের মূল আসনটিতে বসবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি।'

বিএনপিকে সত্য সত্যই জামায়াতের সম্ভাব্য গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারতো যদি দলটিতে এক দল চরিত্রবান, আদর্শনিষ্ঠ তরুণের আবির্ভাব ঘটতো এবং তারেক রহমান তাদের নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু বিএনপির রাজনৈতিক আদর্শটা কী, যে আদর্শের টানে দলে দলে তরুণ দলটিতে এসে জুটতে পারে? ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা ক্ষমতা, অর্থ ও স্বার্থের লোভে এসে দলটিতে জুটছে। জামায়াতীরা ইসলামের নামে যে আদর্শের মরীচিকা তার তরুণ ক্যাডারদের সামনে তুলে ধরছে, বিএনপি গণতন্ত্র, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বা অন্য কোনো কিছুর নামেই সে আদর্শের মরীচিকা দলের তরুণদের সামনে তুলে ধরতে পারছে না। তারেক রহমানও তা পারেননি বা পারতে চাননি। তাঁর হাওয়া ভবন আদর্শ ও কর্মসূচীকে ভিত্তি করে নয়–স্বার্থ, লোভ ও ক্ষমতার দর্পকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

আজ যদি বিএনপি ক্ষমতায় না থাকে, তাহলে হাওয়া ভবন থাকবে না। হাওয়া ভবনকে ঘিরে একচ্ছত্র ক্ষমতার বলয় না থাকলে সেখানে যে তারুণ্যের ভিড় দেখে আমার কোনো কোনো কলামিস্ট বন্ধু মুগ্ধ ও মোহিত, সেই ভিড়ও সেখানে থাকবে না। কিন্তু আওয়ামী লীগের মাথায় যতো নির্যাতন-নিপীড়ন নেমে আসুক, তার ছাত্র ও যুব সংগঠনে জোয়ারের কচুরিপানার মতো তরুণের সংখ্যা যতো কম হোক, এই সংগঠনগুলো টিকে থাকবে। জামায়াতের সাধ্য হবে না, আওয়ামী লীগকে বিএনপির মতো গ্রাস করে অথবা ধ্বংস করে। আওয়ামী লীগ সুদিনে-দুর্দিনে পঞ্চাশ বছর ধরে টিকে আছে। আওয়ামী লীগের ইতিহাসই হচ্ছে, প্রত্যেকটি বিপর্যয়ের পরই সে নতুন করে জেগে ওঠে বা বেঁচে ওঠে।

আমার যে কলামিস্ট অথবা সাংবাদিক বন্ধুরা বিএনপিতে জোয়ারের ফেনার মতো চরিত্রহীন তারুণ্যের ভিড় দেখে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ ভেবে ভীত, তাঁরা আমার অপরাধ না নিলে মপাঁসার একটি গল্প এখানে বলতে চাই। বহু আগে পড়া গল্প। সবটা মনে নেই। যেটুকু মনে আছে, সেটুকুই আমার এই আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক। প্যারিসের এক নব্য ধনী একদিন এক অভিজাত সরাইখানায় গিয়ে এক রাত্রির জন্য একটি কক্ষ ভাড়া নিলেন এবং সরাইখানার মালিককে ডেকে বললেন, তিনি শহরের সবচাইতে সুন্দরী তরুণীকে উপভোগ করতে চান। যতো টাকা লাগে লাগুক। কিন্তু প্যারিসের নাম্বার ওয়ান সুন্দরীকে তিনি চান।

সরাইখানার মালিক যথা আজ্ঞা বলে বিদায় নিলেন এবং এক অপরূপা সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে ধনী ব্যক্তির কাছে হাজির হলেন। বললেন, 'মঁসিয়ে, এর চাইতে সুন্দরী তরুণী প্যারিসে আর নেই। কিন্তু আপনাকে প্রচুর টাকা দিতে হবে, যা কেবল ইউরোপের কোনো রাজা দিতে পারেন।' ধনী বললেন, 'কুছ পরোয়া নেহি, আমি তাই দেব।' সরাইখানার মালিক খুশি হয়ে বিদায় নিলেন এবং সারা রাত ওই ধনী তরুণীকে নিয়ে ফুর্তি করার পর তাকে হাসতে হাসতে বললেন, 'জানো আমি ধনী নই, যুবকও নই। কোনো রকমে কিছু টাকা জোগাড় করে প্যারিসের সবচাইতে সুন্দরী যুবতীকে ভোগ করার জন্য এই সরাইখানায় ধনী যুবক সেজে এসেছি। এখন যদি আমার নকল দাঁত, পরচুলা খুলে ফেলি, তাহলে দেখবে আমি এক বৃদ্ধ।' তার কথা শুনে সুন্দরী তরুণীও হাসতে লাগলো। বললো, তোমার ধারণা, সরাইখানার মালিক প্যারিসের সবচাইতে সুন্দরীকে এনে প্রচুর টাকার বিনিময়ে তোমাকে উপঢৌকন দিয়েছে? তাহলে দ্যাখো।'

বলতে বলতে সুন্দরী তার নকল দাঁত, পরচুলা খুলে ফেললো। এমন কি বক্ষবন্ধনী খুলে নকল স্তনও দেখালো। মুখের ও শরীরের প্রসাধন মুছে ফেললো। দেখা গেল, সব কৃত্রিমতার আড়াল থেকে এক লোলচর্ম বৃদ্ধা বেরিয়ে আসছে। গল্পটি এখানেই শেষ। এখন বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর নীতিকথাটিও বলি। আজ হাওয়া ভবনে বা বিএনপিতে তারুণ্যের যে নতুন রক্তের সঞ্চালন, 'তরুণ সমাজের গতিশীলতা' দেখে আমার কোনো কোনো বন্ধু মুগ্ধ; হঠাৎ যদি বিএনপি ক্ষমতাচ্যুত হয়, দলটি বা ভবনটির অঙ্গ থেকে পুলিশ, বিডিআর, আর্মি, জুডিশিয়ারি, মিডিয়া– অর্থাৎ ক্ষমতার সব অলঙ্কার ও আবরণ খসে পড়ে, তাহলে দেখা যাবে, সেই বিএনপি ও হাওয়া ভবনের অবস্থা মপাঁসার গল্পের ওই সুন্দরীর মতো।

সম্ভবত ভবিষ্যতের এই অবস্থার কথাই ভেবে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তাঁর দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে আগেভাগেই বলেছেন, "আগামী নির্বাচনে জিততে না পারলে পালানোর পথ পাওয়া যাবে না। সকলকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে।" যে দল নাকি আগামী পঞ্চাশ বছরেও ক্ষমতা হারাবে না এবং তারেক রহমানের মতো তরুণ নেতার সঞ্জীবনী স্পর্শে যে দলে তারুণ্য টগবগ করে ফুটছে, একটা নির্বাচনে হারলেই অর্থাৎ ক্ষমতাহারা হলেই সেই দলকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে কেন? তার তারুণ্যের শক্তি তখন কোথায় যাবে? আমার এক কলামিস্ট বন্ধু লিখেছেন, "তারেক রহমান যে বিএনপি নামক দলটিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্রিয় হয়েছেন, তা বোঝা যাচ্ছে।"

এই মন্তব্যটি এবং প্রধানমন্ত্রীর উক্তি সম্পর্কে আমার আরেক বন্ধুর প্রতিক্রিয়াটিও উল্লেখ করার মতো। তিনি বলেছেন, "বিএনপিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দলের তরুণ নেতৃত্ব যে দারুণ সক্রিয়, তা বোঝা যায় ঢাকায় শান্তিপূর্ণভাবে বিকল্প ধারার সভা করতে গিয়ে ডা. বি চৌধুরী ছেলে মাহী চৌধুরীকে নিয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য রেললাইন ধরে দৌড়াতে দেখে। তাদের মাথার ওপরে তখন তারুণ্যের ডাণ্ডা উদ্যত ছিল। রংপুরে এবং ময়মনসিংহেও ড. কামাল ও ডা. চৌধুরীর সভায় ডাণ্ডার সাহায্যে 'এই তারুণ্য' কিভাবে বিএনপি নামক দলটিকে চমৎকার প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে, তা দেখা গেছে। এমন তারুণ্যশক্তির অধিকারী যে দল, একটি নির্বাচনে হারলেই তাদের নেতাকর্মীদের কেন পালিয়ে বেড়াতে হবে, তাতো বুঝতে পারছি না।" আমিও এই বন্ধুকে এ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানদান করতে পারিনি।

আওয়ামী লীগে অবশ্য তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশিভাবে টানা দরকার। আওয়ামী লীগ তরুণ প্রজন্ম থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়েছে, বা 'দলটি গতিহারা হওয়ায় দেশের বিরাট তরুণ নেতৃত্বকে আকৃষ্ট করতে পারছে না'–এ ধরনের মন্তব্য বা বিশ্লেষণ কতোটা সঠিক সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। দলটি যদি তরুণ প্রজন্ম থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত হতো, তাহলে দেশের কয়েকটি বিশেষ বাম দলের দশাপ্রাপ্তি ঘটতো। ক্ষমতা থেকে পতন এবং ২০০১ সাল থেকে ক্রমাগত বিপর্যয়ের মুখে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং দলের সাংস্কৃতিক অঙ্গসংগঠনগুলো একটাও এতোটা শক্তিশালী থাকতো না এবং তাতে দিনের পর দিন এতো নির্যাতনের মুখে নতুন ও তরুণ মুখের আবির্ভাব দেখা যেতো না।

তবে আগের চাইতে আশির ও নব্বইয়ের দশকের তরুণেরা আওয়ামী লীগের দিকে কম আকৃষ্ট হয়েছে একথা সত্য। এটা আওয়ামী লীগের 'গতিহারা হওয়ার' জন্য ঘটেনি। ঘটেছে দেশের ভিতরের পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তিত হওয়ার জন্য। আশির দশকের সূচনা– অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বিপর্যয় এবং ধনবাদী-শিবিরের একক অভ্যুত্থানের সূচনা থেকেই শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে আদর্শবাদী রাজনীতির পতন শুরু হয়। পৃথিবীর উন্নত-অনুন্নত সকল দেশেই ছাত্রসমাজই ছিল সকল অগ্রসরমুখী চিন্তাচেতনা ও আদর্শবাদী আন্দোলনের ভ্যানগার্ড। সেই ছাত্রসমাজের মধ্যে গ্রিড, ভায়োলেন্স ও সেক্সের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়।

বাংলাদেশে এই বিষ তরুণ সমাজে সঞ্চার করা হয়েছে আরও ভয়ানকভাবে। রাষ্ট্রের মূল আদর্শগুলোকে শুধু সংবিধান থেকে নয়, পাঠ্যপুস্তক থেকেও বাদ দেওয়া হয়। সেখানে তরুণ প্রজন্মকে বছরের পর বছর ধরে গেলানো হয় এক বিকৃত ইতিহাস। দেশের প্রকৃত নায়কদের স্মৃতি মুছে ফেলে খলনায়কদের সমাজের ও রাষ্ট্রের উচ্চাসনে বসানো হয়। আগে যে ছাত্র ও তরুণ সমাজ ছিল মানব কল্যাণের আদর্শের পতাকাবাহী, সর্বপ্রকার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন, জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের সময় থেকে শুরু হয় তাদের চরিত্র ধ্বংসের পরিকল্পিত চেষ্টা। আদর্শের বদলে তাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সন্ত্রাস, লোভ, ক্ষমতার সর্বনাশা আসক্তি। ক্রমাগত ইতিহাস-বিকৃতি ও মিথ্যা প্রচারের মধ্যে আশির দশক থেকে যে তরুণ প্রজন্মের অভ্যুদয় ঘটে, তাদের একটা বড় অংশই সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র ও ভিন্ন মানসের তরুণ। আওয়ামী লীগের সেক্যুলার জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে বড় কোনো আকর্ষণ নয়। তাদের কাছে বড় আকর্ষণ অস্ত্রের শক্তি, লাইসেন্স, পারমিটবাজি, দলবাজি এবং যে কোনো প্রকারে আত্মস্বার্থের চরিতার্থতা।

সামরিক শাসনে অথবা স্বৈরাচারী শাসনে নষ্ট হওয়া অথবা পথভ্রষ্ট এক বা দুই জেনারেশনের সমস্যায় অনেক দেশকেই ভুগতে হয়েছে। মার্কিন ইতিহাসবিদ ও কলামিস্ট লুই ফিশার তার 'ফল অব থার্ড রাইখ' বইটিতে লিখেছেন, 'জার্মানিতে হিটলারের ফ্যাসিবাদের পতনের পরও বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সমস্যাটি হলো, নাৎসিরা যে ব্যাপক তথ্য-বিকৃতি ও ইতিহাস-বিকৃতির মাধ্যমে একটি তরুণ প্রজন্ম সৃষ্টি করে রেখে গেছে তাদের প্রভাব থেকে জার্মান সমাজ-মানসকে কিভাবে মুক্ত করা যায় এবং গণতান্ত্রিক জার্মানি পুনর্গঠনের পথে তরুণদের আবার টেনে আনা যায়। হিটলারের জার্মানিতে তরুণেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অনেক উন্নতি করেছিল। কিন্তু এর পেছনে কোনো আদর্শবাদিতা না থাকায় তরুণদের এই উন্নত জ্ঞান ও মেধাকে ধ্বংসাত্মক কাজেই ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল নাৎসিদের। নাৎসিদের পতনের পর চ্যান্সেলর অডেনয়ারকে তাই প্রথমে হিটলারের আমলে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের মস্তিষ্ক শোধন ও চরিত্র পুনর্গঠনের জন্যই এক দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হয়েছিল। হিটলারের পতনের ৫৯ বছর পরেও জার্মান তরুণদের একাংশের মধ্যে হিটলারের প্রতি ভক্তি এবং তার স্বস্তিকাচিহ্নের প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করার মতো।

বাংলাদেশেও দীর্ঘ সামরিক ও স্বৈরাচারী আমলের ইতিহাস-বিকৃতি, অসত্য প্রচার ও অসাধু রাজনীতির মোহজাল ছিন্ন করে দুই দশকের তরুণদের এক বিরাট অংশের মনমানসিকতা সুস্থ করার কাজটি শেষ করতে যেমন দীর্ঘ সময় লাগবে, তেমনি লাগবে সঠিক পরিকল্পনা। কোনো প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার আগে এই কাজটি কারও পক্ষেই শুরু করা সম্ভব নয়, সহজও নয়। সুতরাং আওয়ামী লীগ কেবল নিজের কোনো ত্রুটির (যেমন গতিহীন হওয়া) জন্য তরুণ সমাজকে আগের মতো আকর্ষণ করতে পারছে না, এমন ঢালাও মন্তব্য সঠিক নয় (পরবর্তী অংশ আগামী সপ্তাহে)।

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর, সোমবার, ২০০৪

কেন এই নিষ্ঠুরতা!

মূল ॥ আজমি বিশারা
রূপান্তর ॥ এনামুল হক

এমন দৃশ্য মোটামুটি একই রূপে অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যায়। দেখা যায় ইরাকের আবু গরিব কারাগারে। দেখা যায় গাজা ও পশ্চিম তীরে। দেখা যায় আফগানিস্তানে, চেচনিয়ায়। ঠিক এক সময় যেমন দেখা গিয়েছিল ভিয়েতনামে ও অন্যান্য দেশে। এসব দৃশ্যের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হলো নিষ্ঠুরতা। মানুষের ওপর মানুষের বর্বরোচিত ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা। এসব দৃশ্যই প্রমাণ করে মানুষ অনেক আগে বন্য-বর্বর অবস্থা অতিক্রম করে এলেও তার মধ্যে আদিম জান্তব প্রবৃত্তি এখনও ক্রিয়াশীল।

ইরাকের আবু গরিব কারাগারে মার্কিন সেনাদের হাতে ইরাকী বন্দী নির্যাতনের নারকীয়, ভয়াল ও কুৎসিত সব দৃশ্য বিশ্বের দেশে দেশে টিভি পর্দায় কিংবা পত্রপত্রিকায় যাঁরাই দেখেছেন তাঁরা শিউরে না উঠে পারেননি। মজার ব্যাপার হলো, নির্যাতনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে এখানে নির্যাতিতের সঙ্গে এমন চেহারায় দেখা গেছে যেন তারা এই ছবি তোলাতে উৎসাহিত বোধ করেছে। এ যেন দারুণ কৃতিত্বপূর্ণ কোন কাজ। বন্দী নির্যাতনের দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করতে দেয়ার উৎসাহের মধ্যে নির্যাতনকারীর এক ধরনের বিকৃত রোমাঞ্চ বা শিহরণ লক্ষ্য করা যায়। এটা হলো অপরাধেরই আরেক রূপ।

গাজায় একবার একদল ইসরাইলী সৈন্যকে জনৈক ফিলিস্তিনী যোদ্ধার কাটা মুণ্ডুকে ঘিরে ছবি ওঠাতে দেখা যায়। কাটা মুণ্ডুটা ছিল বেয়োনেটবিদ্ধ এবং মুখে গুঁজে দেয়া হয়েছিল সিগারেট। ইসরাইলী সৈন্যদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল জান্তব চাপা উল্লাস। আরেক ইউনিটের সৈন্যরা ছবি তুলেছিল একটি বালকের বুলেট-ঝাঁঝরা লাশের সঙ্গে। বালকটিকে তারা সন্ত্রাসবাদী ভেবে গুলি করে মারে যদিও পরে প্রমাণিত হয় সে ছিল নির্দোষ। নির্দোষকে হিব্রু ভাষায় সংক্ষেপে বলে "হাফি"। তাদের মধ্যে অনুশোচনার লেশমাত্র তো ছিলই না, উপরন্তু তারা এমনভাবে "হাফি" শব্দটি বলতে থাকে যেন ছেলেটির নির্দোষতাও ছিল এক দারুণ মস্করার ব্যাপার। পরে তারা ছেলেটির লাশ একটা গাড়ির সঙ্গে বেঁধে সেনা ক্যাম্পের চারপাশে কয়েক চক্কর মারে।

কাটা মুণ্ডুর ঐ ছবিটা দেখলে যে কারোর মনে পড়ে যাবে অলিভার স্টোনের "প্লাটুন" ছবিটির কথা। ভিয়েতনামের পটভূমিতে নির্মিত ঐ ছবিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে যুদ্ধ ও মৃত্যুর বিভীষিকা একদল মার্কিন সৈন্যকে বিকৃত রুচির উন্মাদে পরিণত করেছিল। সেই বিকৃতি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, তাদের একজন নিহত এক ভিয়েতনামীর কর্তিত মাথাটিকে মাসকট বা সৌভাগ্য বয়ে আনা বস্তু হিসাবে নিজের ব্যাগপ্যাকে করে সর্বত্র বয়ে বেড়াতে থাকে। কাটা মুণ্ডুটি পরে পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করার আগ পর্যন্ত মার্কিন সৈন্যরা তাদের সহকর্মীর এহেন আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা খুঁজে পায়নি।

বিকৃত মানসিকতা থেকে নিষ্ঠুরতায় মেতে ওঠার সর্বশেষ একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে চলতি বছরের অক্টোবর মাসের একটি ঘটনায়। সে সময় ইমাম আল হিমস্ নামে এক ফিলিস্তিনী তরুণীকে গুলি করে মারতে গিয়ে এক ইসরাইলী সেনা মেশিন গানের সমস্ত কার্তুজ শেষ করে দিয়েছিল এবং তার পর ঘটনাটি সে গর্বের সঙ্গে সবাইকে বলে বেড়িয়েছিল। পরে অবশ্য সে তার আচরণের সাফাই গায় এই বলে যে, মেয়েটির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যই সে অমন কাজ করেছিল। ইসরাইলী অফিসাররা সৈনিকটির আচরণের সমালোচনা করলেও ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

প্রশ্ন হলো শত্রুর লাশ নিয়ে কিংবা নির্যাতিতদের নিয়ে নিজেদের ছবি তোলার এই প্রবণতা কেন সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে? আগেই বলা হয়েছে যে, এর পিছনে একটা বিকৃত মানসিকতা কাজ করে। কিন্তু তেমন মানসিকতা সর্বজনীন হতে যাবে কেন? এর একটা ব্যাখ্যা হলো এমন ছবি তোলার মধ্যে যে বিকৃত আনন্দ সেটা আসলে এক ধরনের ক্ষিপ্ত বর্ণবিদ্বেষ বা জাতিবিদ্বেষের অভিব্যক্তি। মার্কিন সৈন্যদের হাতে ইরাকী বন্দী নির্যাতনের দৃশ্যের মধ্যে যেমন সেই জাতি বিদ্বেষের অতিপ্রকাশ দেখা যাবে, সেই একই জাতিবিদ্বেষ দেখা যাবে ইসরাইলীদের হাতে নির্দোষ আরবের মৃত্যুবরণের দৃশ্যের মধ্যেও। তবে এটাই সব কথা নয়। শত্রুর লাশ বা অত্যাচারিত বন্দীর সঙ্গে ছবি তোলার বিকৃত আনন্দের মধ্যে আরেকটি দিকও প্রকাশ পায়। সেটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উৎকট রূপ। একটা দেশ যখন সামরিক শক্তিবলে অন্য একটি দেশকে দখল করে নেয় তখন দখলদার দেশটির ব্যক্তি পর্যায়ের মানুষগুলোর অবচেতন মনেও দখলদারের মানসিকতা এসে ভর করে। দখলদার হিসাবে ব্যক্তির ক্ষমতা তখন হয়ে ওঠে সীমাহীন। সে তখন দখলকৃত দেশটির মানুষের চরমতম পর্যায়ে অপমানিত ও অবদমিত করার চেষ্টা করে। আধুনিক যুগের প্রথম দিকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে এই উৎকট রূপের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য এই খানে যে, এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে চলে পরমাণুকরণের

প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিবিশেষের সকলেই আসলে একে অপরের ক্লোন বা প্রতিরূপে পরিণত হয়। তাদের পরিধানে যেন একই ধরনের ইউনিফর্ম এবং সবাই যেন একই ধরনের কাজে নিয়োজিত। এর সঙ্গে যদি সামরিক দখলদারীর অবস্থা এসে যোগ হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। দখলদার দেশের ব্যক্তি তখন দখলীকৃত সমাজের ব্যক্তি জীবনের ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে বসে। সে তখন অত্যাচারিতের সঙ্গে ছবি তুলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরপক্ষের হীনত্ব জাহির করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এসব ব্যাপার তো আছেই। তার ওপর আছে যুদ্ধ নামক এক ভয়ঙ্কর সংহারী দানব। সেই দানব যা কিছু ভাল, যা কিছু উৎকৃষ্ট সবই ধ্বংস করে দেয়। ধ্বংস করে দেয় জীবন এবং সেই সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধ। দয়া, মায়া, মমতা, অনুকম্পা, সহমর্মিতার মতো মানবিক অনুভূতিগুলোকেও যুদ্ধ ধ্বংস করে দেয়। সেটা আরও বেশি সত্য হয়ে ওঠে সেই দেশের মানুষ ও সৈনিকদের ক্ষেত্রে যখন দেশটি অন্যের ওপর আগ্রাসন চালায় কিংবা অন্যায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যেমন আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধ অথবা ইসরাইলের ফিলিস্তিন যুদ্ধ। এসব যুদ্ধে তাই হানাদারদের অকারণেই হিংস্র হয়ে উঠতে দেখা যায়। অকারণেই তারা নিষ্ঠুরতায় মেতে ওঠে। শত্রুর লাশ নিয়ে পৈশাচিক উল্লাস করে। তাদের এই হিংস্রতার জবাব দিতে অপর পক্ষও কিছু কিছু নিষ্ঠুর আচরণ যে করে ফেলে না তা নয়। যেমন ফিলিস্তিনীরা। তারা কল্পনাতীত রকমের সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার শিকার। তারা এত বেশি অত্যাচারিত হয়েছে যে শত্রুর প্রতি ঘৃণায় কিংবা প্রতিশোধস্পৃহায় অনেকের স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতিকেও অসাড় হয়ে যেতে দেখা যায়। গত ১২ মে পশ্চিম তীরে একটি ইসরাইলী ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হয়ে একজন ইসরাইলী অফিসার ও চারজন ইসরাইলী সৈন্য নিহত হলে তাদের লাশ নিয়ে ফিলিস্তিনীরা যেভাবে আনন্দ মিছিল করে তাতে অনেকে শিউরে ওঠে। লাশগুলোকে পদদলিত করে এবং অন্যান্য উপায়ে তারা তাদের ঘৃণা প্রকাশ করে। তবে তাদের আচরণের সঙ্গে ইসরাইলী ও অন্যদের আচরণের অবশ্যই পার্থক্য টানতে হবে। মনে রাখতে হবে ফিলিস্তিনীরা আক্রান্ত, অন্যের আক্রমণের শিকার। তারা অত্যাচারিত এবং প্রতিমুহূর্তে তাদের ওপর নিষ্ঠুরতা চলছে। কাজেই অত্যাচারের জবাবে মাঝে মধ্যে তাদের এ ধরনের দু'একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলা অস্বাভাবিক নয়। নিষ্ঠুরতা যদি তাদের দিক থেকে হয় তার জন্য তারা দায়ী নয়–দায়ী তাদের ভূখণ্ড জবরদখলকারী শক্তি।

সূত্র : আল আহরাম উইকলি

ভোটের পর ভারতীয়দের সংশয় কেটেছে

হারুন চৌধুরী, ওয়াশিংটন থেকে

এবারের যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে যারা বিদেশী ইমিগ্র্যান্ট এবং হালে এখন ইউএস সিটিজেন তারা কেরিকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছিল। বিশেষ করে আরব মুসলিম ওয়ার্ল্ড। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে তারা এবার তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেও কেরিকে জেতাতে পারেনি। অনেকে মনে করেন, কেরির পরাজয়ের মূল কারণ নির্বাচনের আগের দিন বিন লাদেনের টেপ ছেড়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি। শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের অনেকে তাদের দেশের নিরাপত্তার কথা ভেবে বুশকে ভোট দিয়েছে। বুশকে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য এক রকম ম্যান্ডেট দিয়ে দিয়েছে, যা ছিল বুশেরও কল্পনার বাইরে। এখন তিনি ভাবছেন পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেবেন।

বুশের জয়ে এবার ভারত ও চীনের জয় হয়েছে। নির্বাচনের আগে জন কেরি ঘোষণা দিয়েছিলেন আউট সোর্সিং চুক্তি বাতিল করে দেশের মধ্যেই জনবল দিয়ে কাজ করিয়ে বেকারত্বের সংখ্যা কমাবেন। এই ঘোষণা দেশ ও বিদেশের ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে ভারতের কনট্র্যাক্ট বেসেসে কোম্পানিগুলো বছরে কোটি কোটি টাকা আয় করেছে। আহমেদাবাদ, দিল্লী, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গে কয়েক হাজার লোকের বেকারত্ব ঘুচেছে। এসব রাজ্যে অল্প ব্যয়ে নামমাত্র ডলারে কর্মচারীদের ওয়েজ দিয়ে কল সেন্টার বসানো হয়েছে। এসব সেন্টার থেকে ফোনে বা অনলাইন সিস্টেমে আমেরিকানদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়া হয়। দিল্লী বা অন্য কোন রাজ্য থেকে তাদের পরিচয় গোপন রেখে ক্রেডিট কার্ড, টেলিফোন, আয়কর, সফটওয়্যারের চলছে রমরমা ব্যবসা। কোথা থেকে কল আসছে আমেরিকানরা এসবের খোঁজখবর রাখে না। কেরির ঘোষণায় এখানকার ইন্ডিয়ান আমেরিকান নাগরিকরাসহ ভারত সরকারও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, যদি কেরি জিতে যান তবে সব চুক্তি বাতিল হয়ে গেলে ভারতে কয়েক হাজার লোক বেকার হয়ে যাবে। যারা কম্পিউটার ফিল্ডে এসে বেকারত্ব ঘুচিয়ে সচ্ছলতার মুখ দেখেছিল সেই নারীদের নির্বাচনের আগে রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। বুশ জিতে যাওয়ায় তাদের সে সংশয় কেটে নিরাশার মাঝে আবার দেখা দিয়েছে আশার আলো।

পার্থ এখন কেমন আছে : প্রবাসীরা উদ্বিগ্ন একটি নিরীহ শিক্ষিত বেকার যুবক পার্থ সাহার ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে তা অমানবিক। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে যে রেজুলেশন পাস করে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ তাকে সমর্থন দিয়েছে–পার্থকে জামিনে মুক্তি না দিয়ে সেই সনদ লঙ্ঘন করেছে বর্তমান সরকার। তাকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে–ওয়াশিংটনভিত্তিক হিউম্যান রাইটস এই অভিমত ব্যক্ত করেছে প্রবাসীদের কাছে।

কিছুদিন আগে ওয়াশিংটন ডিসিতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের আমন্ত্রণে এসেছিলেন বিশিষ্ট কলামিস্ট ও ভোরের কাগজের সম্পাদক আবেদ খান। ওয়াশিংটনে বসবাসরত কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তিনি মতবিনিময়কালে পার্থর মুক্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

হিউম্যান রাইটস কোয়ালিশনের চেয়ারম্যান ড. গোলাম ফরিদ আক্তার ও বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী বিজ্ঞানী ড. নাজমা জাহান বলেন, সরকার একটার পর একটা মামলার কোন কূলকিনারা করতে না পেরে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। ময়মনসিংহের বোমা হামলায়ও জড়ানো হয়েছে ড. মুনতাসীর মামুন, আবেদন খান ও শাহরিয়ার কবিরের মতো লোকদের। তাঁরা কি সন্ত্রাসী? তবে দেশে সন্ত্রাসী কারা? তাঁরা জামায়াতের টার্গেট। কারণ জামায়াত সেক্যুলারিজিমকে ধ্বংস করে ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়।

পার্থ হিন্দু বলেই তাকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। আদালতও কিছু করছে না। আইনের চোখে সব মানুষ সমান। তাহলে পার্থকে জামিনে মুক্তি দিতে বাধা কোথায়? সে তো বাংলাদেশের নাগরিক। প্রবাসীদের আজ একটাই প্রশ্ন–পার্থর মুক্তি কবে হবে?